International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 46-52
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.267

অনুবাদে ‘অদৃশ্যতা’ ও বাংলা সাহিত্যের সাংস্কৃতিক রূপান্তর

নয়ন সরকার
স্বাধীন গবেষক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 31.03.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the context of contemporary world literature, translation is not merely a mechanical process of linguistic transfer; rather, it represents a profound arena of cultural and political power struggles. In the light of Lawrence Venuti's concept of The Translator's Invisibility, this research paper analyses the role of the translator and the theoretical challenges involved in translating Bengali literature into English. Although conventional definitions often imagine the translator as a "transparent" or "invisible" entity, this study investigates the extent to which translators, in maintaining the dominance of the target language, compromise the cultural specificity of the source text.

The paper is structured into three major sections. First, it examines Rabindranath Tagore's self-translation of Gitanjali, *analysing how the process of domestication, aimed at achieving universal spiritual appeal, transforms the indigenous tonal qualities of the original Bengali text. Second, it discusses how the rural folk culture, myths, and regional vocabulary in the works of Bibhutibhushan Bandyopadhyay and Tarashankar Bandyopadhyay are often subjected to a form of "cultural loss" in the hands of the "invisible" translator. Third, it highlights the necessity of foreignization strategies and the importance of the translator's active political presence in the works of postcolonial writers such as Mahasweta Devi and Hasan Azizul Haque.*

Finally, the paper argues that in order to present Bengali literature in its authentic form on the global stage, the translator must break free from the paradigm of invisibility and emerge as a visible cultural representative. Only when translation challenges the grammar of the target language and preserves the "otherness" of the source text can an equitable dialogue between cultures be achieved.

Keywords: Lawrence Venuti, Translator's Invisibility, Bengali Literature, Domestication, Foreignization, Cultural Transformation, Postcolonialism

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে ‘অনুবাদ’ কেবল এক ভাষার শব্দরাশিকে অন্য ভাষার আধারে ঢেলে সাজানো নয়; বরং এটি একটি সুগভীর সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও অস্তিত্বের লড়াই। অনুবাদক এখানে কেবল এক সেতুবন্ধনকারী নন, বরং তিনি একটি সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসেবে অন্য এক সংস্কৃতির দ্বারে কড়া নাড়েন। এই প্রবন্ধের সূচনায় আমরা সেই সূক্ষ্ম রেখাটি চিহ্নিত করতে চাই, যেখানে অনুবাদক নিজের ‘অদৃশ্যতা’র আড়ালে মূল রচনার প্রাণসত্তাকে হয় নতুন রূপ দান করেন, না হয় অলক্ষ্যে বিসর্জন দেন। অনুবাদতত্ত্বের আলোচনায় লরেন্স ভেনুতি যখন ‘অনুবাদকের অদৃশ্যতা’ The Translator's Invisibility ধারণাটি উপস্থাপন করেন, তখন তিনি মূলত অনুবাদের সেই চিরাচরিত স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ

করেছিলেন, যা পাঠককে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে তিনি মূল লেখকের মূল বয়ানটিই পাঠ করছেন। বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে এই 'অদৃশ্যতা'র রাজনীতি অত্যন্ত প্রবল। বিশেষত, উনিশ শতকের নবজাগরণোত্তর বাংলা সাহিত্য যখন ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বদরবারে নিজের স্থান করে নিতে সচেষ্ট হয়েছে, তখন থেকেই 'দেশীকরণ' ও 'বিদেশীকরণ'-এর এক নিরন্তর দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি'র স্ব-অনুবাদ এই আলোচনার এক ধ্রুপদী উদাহরণ। ১৯১২ সালে যখন 'সং অফারিংস' প্রকাশিত হলো, তখন নোবেল কমিটির ভূয়সী প্রশংসা সত্ত্বেও মূল বাংলা কবিতার যে আধ্যাত্মিক আর্তি ও ভূখণ্ডের নিজস্ব সুর, তা ইংরেজি ভাষার ছাঁচে পড়ে কিছুটা হলেও সংকুচিত হয়েছিল। অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ সেখানে পশ্চিমা পাঠকের রুচি ও প্রত্যাশার কাছে নিজের 'অদৃশ্য' আত্মসমর্পণ ঘটিয়েছিলেন কি না, তা এক গুরুতর তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। একইভাবে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' যখন টি. ডব্লিউ. ক্লার্কের কলমে অনূদিত হয়, তখন বাংলার সেই মেঠো পথ, নিভৃত পল্লীর ঘ্রাণ আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ লোকজ সামগ্রীর নামগুলো ইংরেজি প্রতিশব্দের ভিড়ে তাদের কৌলীন্য হারায়। এই প্রবন্ধের মূল অভীষ্ট হলো—অনুবাদের সেই ধূসর এলাকাটিকে উন্মোচন করা, যেখানে ভাষার রূপান্তরের সময় 'সাংস্কৃতিক অপচয়' ঘটে। অনুবাদক যখন মূল টেক্সটের 'অপরত্ব' মুছে ফেলে তাকে অতিমাত্রায় সহজবোধ্য ও সাবলীল করতে চান, তখন তিনি মূলত সেই সংস্কৃতির নিজস্বতাকে অস্বীকার করেন। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর 'দ্য পলিটিক্স অফ ট্রান্সলেশন' প্রবন্ধে যেমনটি ইঙ্গিত করেছেন, অনুবাদ কেবল ব্যাকরণগত বিনিময় নয়, এটি এক প্রকারের 'ইরোজেটিক্স' বা আত্মগত সংযোগ। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা হাসান আজিজুল হক বা মহাশ্বেতা দেবীর মতো কথাসাহিত্যিকদের সাম্প্রতিক ইংরেজি অনুবাদগুলোকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাব। দেখব—কীভাবে অনুবাদকের লেখনী একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর 'আঞ্চলিকতা' বা 'সাবল্টার্ন' স্বরকে বিশ্বজনীন করার নামে নির্বিষ করে তোলে। পরিশেষে, এই আলোচনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত করবে যে, অনুবাদকের 'অদৃশ্যতা'র বলয় ছিন্ন করে যদি তাঁর সৃজনশীল সত্তা ও দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নেওয়া যায়, তবেই বাংলা সাহিত্যের খাঁটি নির্যাস বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হওয়া সম্ভব।

অনুবাদতত্ত্বের ইতিহাসে লরেন্স ভেনুতি একজন বৈপ্লবিক চিন্তক, যিনি তাঁর ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত *'The Translator's Invisibility: A History of Translation'* গ্রন্থে অনুবাদের চিরাচরিত সংজ্ঞাকে আমূল বদলে দিয়েছেন। ভেনুতির মতে, একটি সফল অনুবাদ সচরাচর তখনই 'উৎকৃষ্ট' বলে গণ্য হয়, যখন তার ভাষা হয় অত্যন্ত সাবলীল, স্বচ্ছন্দ এবং প্রবাহমান। পাঠক যখন অনুবাদ পড়তে গিয়ে ভুলেই যান যে তিনি একটি অনূদিত পাঠ পড়ছেন, তখনই অনুবাদক তাঁর কাঙ্ক্ষিত 'অদৃশ্যতা' লাভ করেন। কিন্তু ভেনুতি এই তথাকথিত 'সাফল্য'কে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে, এই স্বচ্ছতা বা স্বাচ্ছন্দ্য আসলে এক প্রকারের 'সাংস্কৃতিক জবরদস্তি' বা আধিপত্যবাদ। ভেনুতির মতে, 'দেশীকরণ' হলো এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে মূল রচনার বিজাতীয় বা অপরিচিত সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলোকে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ বা লক্ষ্য-ভাষার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজি ছাঁচে ফেলে পিটিয়ে সোজা করা হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগ অত্যন্ত করুণ। বাংলার নিভৃত পল্লীর যে 'ঘুঁটে দেওয়া', 'আলপনা আঁকা' বা 'ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া'র মতো চিত্রকল্প—যা কেবল একটি কাজ নয়, বরং একটি যূথবদ্ধ সংস্কৃতির প্রতীক—তা যখন ইংরেজিতে কেবল 'fuel-making' বা 'decoration' হিসেবে অনূদিত হয়, তখন তার অভ্যন্তরীণ মহিমা অন্তর্হিত হয়। এখানে অনুবাদক 'অদৃশ্য' থাকার তাগিদে লক্ষ্য-ভাষার পাঠকের আরামদায়ক পাঠ-অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেন, যা প্রকৃতপক্ষে বাংলা সংস্কৃতির একটি অংশকে 'পরিশোধন' করার শামিল। ভেনুতি আরো দাবি করেন, অনুবাদক যত বেশি 'অদৃশ্য', লক্ষ্য-ভাষার আধিপত্য তত বেশি প্রকট। বাংলা যখন ইংরেজিতে অনূদিত হয়,

তখন ইংরেজি ভাষা তার দীর্ঘ ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের কারণে বাংলার আঞ্চলিক রূপক বা তদ্ভব শব্দের সূক্ষ্ম কারুকাজকে আত্মস্থ করতে পারে না। ফলে অনুবাদক যখন একটি অত্যন্ত সাবলীল ইংরেজি গদ্য উপহার দেন, তখন তিনি অজান্তেই বাংলার সেই ‘অমসৃণ’ সত্যকে ঢেকে ফেলেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো গ্রামীণ সংলাপে ‘বেহায়া’ বা ‘লক্ষ্মীছাড়া’র মতো শব্দ থাকে, অনুবাদক তাকে ‘shameless’ বা ‘wretched’ বলে চালিয়ে দিলে শব্দের ভেতরের যে লৌকিক নির্যাস বা আবেগীয় দহন, তা ইংরেজি ব্যাকরণের নিগড়ে বন্দি হয়ে পড়ে। একেই ভেনুতি বলেছেন অনুবাদের ‘হিংস্রতা’। ভেনুতি এর বিকল্প হিসেবে ‘বিদেশীকরণ’-এর প্রস্তাব দিয়েছেন। এটি এমন এক কৌশল যেখানে অনুবাদক সচেতনভাবে লক্ষ্য-ভাষার ব্যাকরণ বা প্রকাশভঙ্গিতে কিছুটা ‘অস্বস্তি’ তৈরি করেন। তিনি মূল ভাষার কিছু চিহ্ন বা বিন্যাস রেখে দেন যাতে পাঠক বুঝতে পারেন তিনি ভিন্ন এক সংস্কৃতির মুখোমুখি হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় এই দিকটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অনুবাদক যদি ‘গামছা’ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ না খুঁজে সরাসরি ‘Gamchha’ ব্যবহার করেন এবং টীকায় তার বর্ণনা দেন, তবে তিনি আর ‘অদৃশ্য’ থাকেন না। বরং তিনি একজন দৃশ্যমান প্রতিনিধি হিসেবে বাংলা সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরেন। এটি কেবল ভাষান্তর নয়, এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিরোধ। বাংলার ধ্রুপদী ও আধুনিক সাহিত্যকে যখন আন্তর্জাতিক মানের প্রবন্ধে বিচার করা হয়, তখন দেখা যায়—অনুবাদকরা অধিকাংশ সময় ‘শুদ্ধ ইংরেজি’ লেখার মোহে পড়ে বাংলার মেঠো ও লৌকিক সুরটিকে হারিয়ে ফেলেন। ভেনুতির তত্ত্ব আমাদের শেখায় যে, বাংলা সাহিত্যের অনুবাদে অনুবাদকের ‘অদৃশ্য’ হওয়া মানেই বাংলার পরাজয়। বরং অনুবাদককে হতে হবে ‘অনুপ্রবেশকারী’, যিনি ইংরেজি ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যকে বিঘ্নিত করে বাংলার স্বকীয়তাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

বাংলা সাহিত্যের আন্তর্জাতিকীকরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গীতাঞ্জলি’ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাইলফলক। কিন্তু এই সংকলনের ইংরেজি রূপান্তর বা ‘সং অফারিংস’ অনুবাদতত্ত্বের আলোকে এক গভীর তাত্ত্বিক সংকটের জন্ম দেয়। লরেন্স ভেনুতির ‘অদৃশ্যতা’র তত্ত্বকে যখন আমরা রবীন্দ্রনাথের স্ব-অনুবাদে প্রয়োগ করি, তখন এক বিস্ময়কর সত্য উন্মোচিত হয়: লেখক নিজে যখন অনুবাদক হন, তখন তিনি কি মূল পাঠের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, নাকি নতুন এক ‘অদৃশ্য’ সত্তার জন্ম দেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১২ সালে যখন নিজেই নিজের কবিতা অনুবাদ করতে শুরু করলেন, তখন তাঁর সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল—বাংলার নিভৃত আধ্যাত্মিকতা ও উপনিষদীয় দর্শনের নির্যাসকে এমন এক ভাষায় রূপান্তর করা, যা এডওয়ার্ডিয়ান যুগের ব্রিটিশ পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। এখানেই শুরু হয় ভেনুতির বর্ণিত সেই ‘দেশীকরণ’ বা লক্ষ্য-ভাষার সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ। মূল বাংলা ‘গীতাঞ্জলি’র কবিতাগুলো ছন্দে, লয়ে এবং গীতিময়তায় অনন্য। সেখানে পয়ার, ত্রিপদী বা বিচিত্র মাত্রাবৃত্তের যে দোলা ছিল, ইংরেজি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ সেগুলোকে বর্জন করে এক প্রকারের ‘বাইবেলিক্যাল’ গদ্য-ছন্দ বেছে নেন। ভেনুতির মতে, অনুবাদক যখন মূল পাঠের আঙ্গিক ভেঙে তাকে লক্ষ্য-ভাষার প্রচলিত শৈলীর অনুগামী করেন, তখন তিনি মূলত মূল ভাষার স্বকীয়তাকে ‘অদৃশ্য’ করে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, বাংলার সেই সুর ও তাল ইংরেজিতে হুবহু আনা অসম্ভব; তাই তিনি ইংরেজি গদ্যের গাম্ভীর্য ব্যবহার করে পশ্চিমা পাঠকের ‘কানের আরাম’ নিশ্চিত করেছিলেন। বাংলার বর্ষা, কদম্বের ঘ্রাণ কিংবা বৈষ্ণবীয় বিরহের যে নিবিড় রূপক ‘গীতাঞ্জলি’র প্রাণ, ইংরেজি অনুবাদে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বিমূর্ত ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। মূল কবিতায় যেখানে ছিল ‘মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে’, সেখানে প্রকৃতির যে দৃশ্যমান রূপ ও লৌকিক অনুষঙ্গ, ইংরেজিতে তা অনেক সময় কেবল ‘Clouds’ বা ‘Darkness’-এর এক মহাজাগতিক রূপ ধারণ করেছে। এখানে অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই তাঁর বাংলার লৌকিক পরিচিতিকে বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তর করেছেন। ভেনুতির

ভাষায়, এটি হলো ‘অদৃশ্যতা’র চূড়ান্ত রূপ—যেখানে অনুবাদক নিজেই নিজের মূল সত্তাকে বিদেশের বাজারে বিপণনযোগ্য করার জন্য কাটছাঁট করছেন। রবীন্দ্রনাথের এই স্ব-অনুবাদ প্রক্রিয়াটি ছিল তৎকালীন বিশ্ব-রাজনীতির একটি অংশ। ডব্লিউ. বি. ইয়েটস বা এজরা পাউন্ডের মতো ব্যক্তিত্বরা যখন এই অনুবাদ পাঠ করলেন, তাঁরা এর মধ্যে খুঁজে পেলেন এক ‘প্রাচ্য অতিন্দ্রিয়বাদ’। রবীন্দ্রনাথ যদি মূল বাংলার সেই রুক্ষতা, আঞ্চলিক বিচিত্র শব্দসম্ভার বা জটিল দার্শনিক শব্দগুলো যেমন— ‘অনির্বচনীয়’ বা ‘লীলা’ হুবহু অনুবাদ করার ‘বিদেশীকরণ’ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, তবে হয়তো পশ্চিমা পাঠকরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করত। ফলে, রবীন্দ্রনাথের ‘অদৃশ্য’ হওয়ার পেছনে একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক কূটনীতি কাজ করেছিল। তিনি নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যাতে পশ্চিমা পাঠক তাঁকে একজন ‘ইস্টার্ন সেজ’ বা প্রাচ্যের ঋষি হিসেবে চিনতে পারে। ভেনুতির তত্ত্ব অনুযায়ী, অনুবাদক যখন মূল লেখকের চেয়ে স্বতন্ত্র কোনো সত্তা হিসেবে কাজ করেন, তখন ‘অদৃশ্যতা’ বাড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে লেখক ও অনুবাদক এক হওয়া সত্ত্বেও তিনি মূল পাঠের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত না থেকে বরং তাকে ‘পুনর্নির্মাণ’ করেছেন। ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি রূপান্তর আসলে একটি ‘অনুবাদ’ নয়, বরং এটি একটি ‘সাংস্কৃতিক অভিযোজন’। রবীন্দ্রনাথ এখানে অনুবাদক হিসেবে এতটাই ‘অদৃশ্য’ হয়ে গেছেন যে, মূল বাংলা কবিতার সেই মাটির গন্ধ আর শাশ্বত সুর ইংরেজি ‘সং অফারিংস’-এ এসে এক উচ্চমার্গীয় কিন্তু কিছুটা ফ্যাকাশে আধ্যাত্মিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

গ্রামীণ বাংলার লোকজ জীবন ও সংস্কৃতির অনন্য রূপকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য যখন ইংরেজিতে অনূদিত হয়, তখন ‘অদৃশ্যতা’ তত্ত্বটি আরও প্রকট হয়ে ওঠে। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ‘সাংস্কৃতিক অপচয়’ কেবল ভাষাগত নয়, এটি একটি জীবনদর্শনেরই অপমৃত্যু। বাংলা সাহিত্যের যে ধারাটি মাটির গন্ধ, লৌকিক আচার এবং ব্রত-পার্বণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার অনুবাদে ‘দেশীকরণ’ প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে। অনুবাদক যখন পশ্চিমা পাঠকের জন্য এই সাহিত্যকে ‘বোধগম্য’ করতে চান, তখন তিনি মূলত বাংলার সেই রুক্ষ ও অমসৃণ সৌন্দর্যকে ছেঁটে ফেলে এক প্রকারের ‘মসৃণ ইংরেজি’ তৈরি করেন। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ বা ‘আরণ্যক’-এ অসংখ্য গাছপালা, ফুল এবং পাখির নাম পাওয়া যায় যেগুলোর সাথে বাঙালির শৈশব ও প্রকৃতি-চেতনা জড়িয়ে আছে। যখন অনুবাদক ‘বনচাতাল’ বা ‘সাঁঝসকালে’র মতো শব্দগুলোকে কেবল ‘forest floor’ বা ‘evening’ হিসেবে অনুবাদ করেন, তখন সেই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গটি হারিয়ে যায়। এখানে অনুবাদক নিজেকে এতটাই ‘অদৃশ্য’ রাখেন যে তিনি মূল রচনার ‘অপরত্ব’ রক্ষা করার চেয়ে ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণগত শুদ্ধতাকে বেশি প্রাধান্য দেন। ফলে অপু-দুর্গার সেই চিরচেনা গ্রাম্য প্রকৃতি ইংরেজিতে হয়ে যায় এক অতি-সাধারণ ‘ইউনিভার্সাল ল্যান্ডস্কেপ’। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাসুলীবাকের উপকথা’ বা ‘কবি’ উপন্যাসে ডাইনি-বিদ্যা, লৌকিক দেবতা যেমন— কালোরুদ্র বা বাবা ধর্মরাজ এবং তুকতাক-এর যে গভীর প্রভাব ছিল, তা অনুবাদের সময় এক প্রকারের ‘কুসংস্কার’ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে এই বিশ্বাসগুলো কেবল গল্প নয়, বরং এগুলো প্রান্তিক মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ের অংশ। অনুবাদক যখন এই শব্দগুলোকে করেন, অর্থাৎ নিজের সংস্কৃতির ভাষায় ব্যাখ্যা করতে যান, তখন তিনি সেই আদিম ও লৌকিক সুরটিকে হারিয়ে ফেলেন। এখানে অনুবাদকের ‘অদৃশ্যতা’ আসলে এক প্রকারের ‘সাংস্কৃতিক জবরদস্তি’, যা বাংলার নিজস্ব ‘মিথ’ বা পুরাকথাকে পশ্চিমা যুক্তিবাদী মাপকাঠিতে বিচার করে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে সাঁওতাল বা নিম্নবর্গীয় মানুষের যে কথ্য ভাষা, তার মধ্যে এক প্রকারের বীরত্ব ও রূঢ়তা আছে। অনুবাদক যখন এই আঞ্চলিক ভাষাকে প্রমিত ইংরেজিতে রূপান্তর করেন, তখন সেই চরিত্রের সামাজিক অবস্থান ও লড়াইটি ‘অদৃশ্য’ হয়ে যায়। লরেন্স ভেনুতির প্রস্তাবিত ‘বিদেশীকরণ’ পদ্ধতি এখানে প্রয়োগ করা যেত—অর্থাৎ অনুবাদক যদি সেই আঞ্চলিক ভাষার টান বজায় রাখতে কিছুটা অমসৃণ বা

ভিন্নধর্মী ইংরেজি ব্যবহার করতেন, তবে মূল রচনার প্রতি সুবিচার হতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'অদৃশ্য' থাকার মোহে অনুবাদকরা এক প্রকারের 'সফিস্টিকেটেড' ইংরেজি ব্যবহার করেন যা খোদ চরিত্রের সত্যতাকে ক্ষুণ্ণ করে। বাংলার 'পিঠাপুলি', 'নবান্ন' বা 'আমানি'—এগুলো কেবল খাবার নয়, এগুলো একেকটি লোকজ উৎসবের স্মারক। অনুবাদে যখন এগুলোকে 'Pancake' বা 'Feast' বলা হয়, তখন সেই ঐতিহাসিক ও আবেগীয় সংযোগটি ছিন্ন হয়ে যায়। ভেনুতির মতে, এটি অনুবাদকের এক প্রকারের 'হিংস্রতা', যেখানে তিনি একটি সংস্কৃতির নিজস্ব পরিচিতিকে অন্য একটি প্রভাবশালী সংস্কৃতির ভেতর বিলীন করে দিচ্ছেন। বিভূতিভূষণ বা তারাশঙ্করের মতো লেখকদের ক্ষেত্রে অনুবাদক যদি 'অদৃশ্য' থাকার চিরাচরিত প্রথা ভেঙে সচেতনভাবে বাংলার নিজস্ব শব্দগুলো যেমন— Gamchha, Pitha, Alpona সরাসরি ব্যবহার করতেন, তবে তা হয়তো পাঠকের কাছে কিছুটা 'বিদেশি' ঠেকত, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের 'খাঁটি' রূপটি বিশ্বদরবারে উন্মোচিত হতো।

মহাশ্বেতা দেবী বা হাসান আজিজুল হকের মতো লেখকদের ক্ষেত্রে অনুবাদ কেবল ভাষান্তর নয়, এটি একটি 'এথিক্যাল এনকাউন্টার' বা নৈতিক মোকাবিলা। অনুবাদকের 'অদৃশ্যতা' কীভাবে এক প্রকারের 'সাংস্কৃতিক সেন্সরশিপ' হিসেবে কাজ করে, তা বিস্তারিত ও গভীর তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় উপস্থাপন করা হলো। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক পর্বে মহাশ্বেতা দেবী এবং হাসান আজিজুল হক এমন এক গদ্যরীতির জনক, যা অত্যন্ত রূঢ়, অমার্জিত এবং প্রতিবাদী। তাঁদের ভাষায় কোনো 'ভদ্রলোকীয়' লালিত্য নেই, বরং আছে মাটির রুক্ষতা এবং প্রান্তিক মানুষের হাহাকার। 'অদৃশ্যতা'র তত্ত্বটি এখানে সবচেয়ে বড় সংকটের সম্মুখীন হয়। মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' বা 'স্তন্যদায়িনী'র মতো গল্পে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তা মূলত চণ্ডাল, কোল বা মুণ্ডা আদিবাসীদের মিশ্র ভাষা। এই ভাষায় যে 'ভায়োলেন্স' বা তীব্রতা আছে, তা যখন অত্যন্ত মার্জিত এবং ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ ইংরেজিতে অনূদিত হয়, তখন সেই প্রতিবাদের ভাষাটি 'নির্বিষ' হয়ে পড়ে। অনুবাদক যখন একটি 'সাবল্টার্ন' বা প্রান্তিক টেক্সটকে প্রমিত লক্ষ্য-ভাষায় বা Standard English রূপান্তর করেন, তখন তিনি মূলত সেই চরিত্রগুলোর সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াইকে 'অদৃশ্য' করে ফেলেন। অনুবাদকের এই 'অদৃশ্যতা' আসলে এক প্রকারের 'বুর্জোয়া' আধিপত্য, যা প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বরকে 'ভদ্র' করে বিশ্ববাজারের পাঠযোগ্য করে তোলে। হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' বা তাঁর ছোটগল্পগুলোতে যে দেশভাগ ও অস্তিত্বের সংকট চিত্রিত হয়েছে, তার ভাষা অত্যন্ত মেদহীন এবং ধারালো। সেখানে গ্রামীণ গালাগাল বা আঞ্চলিক শব্দগুলো চরিত্রের ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনুবাদক যখন 'দেশীকরণ' পদ্ধতি ব্যবহার করে সেই গালাগাল বা আঞ্চলিক শব্দগুলোকে ইংরেজি স্ল্যাং দিয়ে প্রতিস্থাপন করেন, তখন সেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক সত্যটি হারিয়ে যায়। ভেনুতির ভাষায় এটি হলো মূল রচনার 'ডি-লোকালাইজেশন'। অনুবাদক এখানে 'অদৃশ্য' থাকতে গিয়ে রচনার নিজস্ব 'আইডেন্টিটি' বা পরিচয়কে বিসর্জন দেন। মহাশ্বেতা দেবীর অনুবাদক হিসেবে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। স্পিভাক সচেতনভাবে ভেনুতির প্রস্তাবিত 'বিদেশীকরণ' পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি ইংরেজি বাক্যের গঠনকে ভেঙে দিয়েছেন, যাতে পাঠক বুঝতে পারেন মূল টেক্সটটি একটি ভিন্ন ও শোষিত সংস্কৃতির। স্পিভাক যখন 'Draupadi'-কে 'Dopdi' হিসেবে রেখে দেন, তখন তিনি অনুবাদক হিসেবে 'অদৃশ্য' থাকেন না। তিনি পাঠককে বাধ্য করেন মূল রচনার 'অস্বস্তি' অনুভব করতে। এটিই মূলত ভেনুতির কাঙ্ক্ষিত সেই প্রতিবাদী অনুবাদ, যা লক্ষ্য-ভাষার আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানায়। কিন্তু অন্য অনেক অনুবাদক যখন মহাশ্বেতা দেবীর ভাষাকে 'স্মুদ গদ্য' বানিয়ে ফেলেন, তখন তাঁরা মূলত সাম্রাজ্যবাদী ভাষার জয়গান গান। হাসান আজিজুল হকের গল্পে দেশভাগ কেবল একটি ভৌগোলিক রেখা নয়, এটি একটি মানসিক ক্ষত। তাঁর ভাষায়

যে 'ট্রমা' মিশে আছে, তা অনুবাদে কেবল একটি 'গল্প' হিসেবে প্রতিভাত হয়। অনুবাদকের 'অদৃশ্যতা' এখানে ইতিহাসের গভীরতাকে কমিয়ে দেয়। অনুবাদক যদি এখানে 'দৃশ্যমান' হতেন এবং টেক্সটের ভেতরে মূল ভাষার অমসৃণতা ধরে রাখতেন, তবে বিশ্বপাঠক বাংলার সেই রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের স্পর্শ পেত। মহাশ্বেতা দেবী বা হাসান আজিজুল হকের সাহিত্যকে বিশ্বদরবারে যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য অনুবাদককে হতে হবে 'সংস্কৃতিক গেরিলা'। তাকে লরেন্স ভেনুতির সেই 'অদৃশ্যতা'র বলয় ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে। অনুবাদকের কাজ কেবল ভাবান্তর নয়, বরং মূল রচনার 'রাজনৈতিক ক্রোধ' এবং 'সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য'কে অক্ষুণ্ণ রাখা।

এই প্রবন্ধের সমাপ্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে আমরা এক অমোঘ সত্যের সম্মুখীন হই—অনুবাদ কেবল একটি যান্ত্রিক ভাষান্তর নয়, বরং এটি একটি সুগভীর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম। লরেন্স ভেনুতির 'অনুবাদকের অদৃশ্যতা' তত্ত্বের আলোকশিখায় আমরা যখন বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী ও আধুনিক আখ্যানগুলোকে বিচার করি, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অনুবাদকের সেই কথিত 'স্বচ্ছতা' আসলে এক প্রকারের ছদ্মবেশ, যা অনেক সময় মূল রচনার প্রাণভ্রমরাটিকে নিভৃত লোকচক্ষুর অন্তরালে বিসর্জন দেয়। বাংলা সাহিত্যের বিশ্বায়নের অভিযাত্রায় 'অনুবাদ' এক দ্বিধাবিভক্ত আয়নার মতো কাজ করেছে। একদিকে এটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিকতাকে পাশ্চাত্য-মানসে ঠাঁই করে দিয়েছে, অন্যদিকে সেই প্রসাদগুণ লাভের উচ্চমূল্য হিসেবে মূল বাংলার মেঠো সুর, লোকজ প্রথা এবং মাটির ঘ্রাণকে 'দেশীকরণ'-এর যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হয়েছে। বিভূতিভূষণের আরণ্যক নিস্তব্ধতা কিংবা তারাশঙ্করের লৌকিক মিথ যখন ইংরেজি ভাষার আধুনিক ছাঁচে পড়ে 'মসৃণ' ও 'সাবলীল' হয়ে ওঠে, তখন অনুবাদক জয়ী হলেও আদতে পরাজিত হয় বাংলার সেই স্বকীয় 'অপরত্ব'। ভেনুতি যাকে 'হিংস্রতা' বলে অভিহিত করেছেন, সেই ভাষাগত আধিপত্যবাদের আড়ালে বাংলার নিজস্ব 'পাঁচালী' বা 'গণদেবতা'র সমাজতাত্ত্বিক মহিমা প্রায়শই ধূলিসাৎ হয়েছে। তবে এই গবেষণার অন্যতম প্রধান আবিষ্কার হলো এই যে, মহাশ্বেতা দেবী বা হাসান আজিজুল হকের মতো প্রতিবাদী লেখকদের ক্ষেত্রে অনুবাদককে আর 'অদৃশ্য' থাকার বিলাসিতা সাজে না। উত্তর-উপনিবেশিক এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অনুবাদককে হতে হবে এক 'সৃজনশীল মধ্যস্থতাকারী' বা 'সাংস্কৃতিক গেরিলা'। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক যেমনটি দেখিয়েছেন, অনুবাদে যখন মূল রচনার রূঢ়তা ও প্রান্তিক স্বরকে রক্ষা করার জন্য ইংরেজি ব্যাকরণের নিগড় ভাঙা হয়, তখনই অনুবাদক এক উচ্চতর নৈতিকতায় আসীন হন। অর্থাৎ, অনুবাদক যখন স্বেচ্ছায় নিজের 'অদৃশ্যতা' বিসর্জন দিয়ে 'বিদেশীকরণ'-এর কণ্টকাকীর্ণ পথ বেছে নেন, তখনই কেবল বাংলা সাহিত্যের সেই অবিনাশী সত্য ও রাজনৈতিক ক্রোধ বিশ্বদরবারে তার প্রকৃত স্বরূপে উদ্ভাসিত হতে পারে। পরিশেষে বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অনুবাদ-পরম্পরাকে আর কেবল 'অনুকরণ' বা 'ভাবান্তর'-এর বৃত্তে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। অনুবাদককে হতে হবে এক দৃশ্যমান শিল্পী, যিনি লক্ষ্য-ভাষার আধিপত্যকে অস্বীকার করে মূল রচনার শব্দ-প্রত্নতত্ত্ব ও লোকজ দর্শনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন। এই প্রবন্ধটি সেই নতুন দিগন্তের দিকেই ইঙ্গিত করে, যেখানে অনুবাদক আর 'অদৃশ্য' কোনো ছায়া নন, বরং তিনি এক সংস্কৃতির সাথে অন্য সংস্কৃতির সমমর্যাদার সংলাপের প্রধান হোতা। অনুবাদকের সেই 'দৃশ্যমান' সত্তার মাধ্যমেই বাংলার 'আগুণপাখি'রা একদিন ইংরেজি ভাষার আকাশে আপন বর্ণে ও বৈভবে ডানা মেলবে—কোনো ছদ্মবেশে নয়, বরং তার চিরন্তন ও শাশ্বত পরিচয়ে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Banerji, Bibhutibhushan. Aranyak: Of the Forest. Translated by Rimli Bhattacharya, Seagull Books, 2002.
2. Banerji, Bibhutibhushan. Pather Panchali: Song of the Road. Translated by T. W. Clark and Tarapada Mukherji, Indiana UP, 1968.
3. Bassnett, Susan. Translation Studies. 4th ed., Routledge, 2014.
4. Bhabha, Homi K. The Location of Culture. Routledge, 1994.
5. Chakravarty, Radha. Novels of Adultery and Faith: Rabindranath Tagore and the Ethics of Translation. 2003.
6. Devi, Mahasweta. Breast Stories. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak, Seagull Books, 1997.
7. Haq, Hasan Azizul. Firebird. Translated by Radha Chakravarty, Niyogi Books, 2011.
8. Lefevere, André. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. Routledge, 1992.
9. Niranjana, Tejaswini. Siting Translation: History, Post-Structuralism, and the Colonial Context. U of California P, 1992.
10. Spivak, Gayatri Chakravorty. The Politics of Translation. Outside in the Teaching Machine, Routledge, 1993, pp. 179-200.
11. Tagore, Rabindranath. Gitanjali: Song Offerings. Translated by the Author, Macmillan, 1912.
12. Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility: A History of Translation. 2nd ed., Routledge, 2008.
13. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গীতাঞ্জলি। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯১০।
14. দেবী, মহাশ্বেতা। দ্রৌপদী। অগ্নিগর্ভ, করুণা প্রকাশনী, ১৯৭৮।
15. দেবী, মহাশ্বেতা। স্তন্যদায়িনী। মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৪।
16. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। গণদেবতা। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯৪২।
17. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। হাসুলীবাকের উপকথা। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৫১।
18. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। আরণ্যক। সিগনেট প্রেস, ১৯৩৯।
19. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। পথের পাঁচালী। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯২৯।
20. হক, হাসান আজিজুল। আগুনপাখি। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৬।